

গোলাম কবির > কলেজ সরকারীকরণ অতঃপর



প্রায় চার দশক প্রাণের তাগিদে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছি। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সব স্তরেই শিক্ষা ও শিক্ষকদের দেখেছি কাছ থেকে। কিন্তু আজকের দিনের মতো এমন দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষার হাল দেখার দুর্ভাগ্য গত শতকের আশির দশক পর্যন্ত আমার হয়নি।

বাঙালি মায়ের মতো করুণামিষ্ণু জন্মবান ও দুর্দশী বঙ্গবন্ধু শিকড় থেকে শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের গভীরে প্রোথিত করার লক্ষ্যে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারি করেছিলেন। বাঙালি রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধুর কাছে বাংলাদেশ ছিল সত্যের মতো। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক পর্যন্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের পরিকল্পনা তাঁর ছিল বলে শোনা যাচ্ছিল। জাতির দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারী দুর্বৃত্তরা তাকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা করলে জাতির সব অগ্রগতি থমকে যায়। ওই সময়ে দেশের কলেজ শিক্ষকরা তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের দাবিতে ধর্মঘট করেন। পাকিস্তানি হায়েনা বাহিনীর পোড়ানীতি অবলম্বনের ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু তখন জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে দিনরাত পরিশ্রম করছেন। তা ছাড়া প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর না দাঁড়ালে কলেজ জাতীয়করণে তেমন সুফল আনবে না। তাই তখন কলেজ সরকারি করা হয়নি।

এবার আমরা একটু পেছনের দিকে ফিরে দেখি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলার ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে সরকারি কলেজ ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইডেন কলেজ ও সিলেট এমসি কলেজ। পুরনো জেলা সদরগুলোতে মোটামুটি মানসম্পন্ন কলেজ ছিল। অনেক মহকুমা সদরে কলেজ ছিল না। শিক্ষার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সব মহকুমা সদরে কলেজ প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। ক্ষমতা দখলকারী আইয়ুব খানের শাসনের সময় কলেজ শিক্ষকদের রাজনীতি ও মুক্তচিন্তা চর্চা বন্ধ করার জন্য জগন্নাথ কলেজ, তারপর বরিশাল বিএম কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ ও রংপুর কারমাইকেল কলেজ সরকারি করা হয় এবং ১৯৬৮ সালে পুরনো জেলা সদরের কলেজগুলো সরকারি করা হলো। বিভাগীয় সদরের মহিলা কলেজগুলো সেই আওতায় আসে। ফলে সরকারি কলেজের সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পাকিস্তানি কায়দায় সেনা শাসকরা ১৯৭৯-৮০ সালে সব মহকুমা সদরের কলেজ সরকারি করে। এই ধারাবাহিকতা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এতে শিক্ষার মান কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা গবেষণাসাপেক্ষ। তবে কিছু মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তর দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়। মহকুমা সদর আর গ্রামগঞ্জের সদ্য সরকারি কলেজের অনেক শিক্ষক আগের সরকারি কলেজে বদলি হয়ে আসার জন্য রাজনৈতিক তদবির ও শিক্ষা অধিদপ্তরে ঘুষ দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করে। তারা সফল হয়। ফলে পিএসসি কর্তৃক বাছাইকৃত শিক্ষকদের গ্রামগঞ্জে ঠেলে দেওয়া হয়। তারা নিয়মনীতিহীন সদ্য সরকারীকৃত কলেজে বদলি হয়ে মানসিক বিপর্যয়ের ফলে হতাশাদায় হয়ে পড়েন এবং আদি সরকারি কলেজের শিক্ষার মান দ্রুত নিম্নগামী হয়। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, পিএসসি যাচাই-বাছাই করা শিক্ষক এবং গজিয়ে ওঠা সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মান সমান নয়। অবশ্য এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে কিছুসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন না তা নয়, তবে নিতান্ত নগণ্য। এ অবস্থায় গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে অবক্ষয় শুরু হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের আকর্ষণের জন্য তখনকার অনেক বেসরকারি কলেজে অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অলিখিত ব্যবস্থা থাকত। কলেজগুলো সরকারি হওয়ার পর সেই সুবিধা রাতারাতি পরিবর্তন

আমাদের শিক্ষাবান্ধব সরকার নতুন সরকারীকৃত কলেজ শিক্ষকদের পুরনো সরকারি কলেজে বদলির ব্যবস্থা রহিত করে শিক্ষার অপমৃত্যু রক্ষা করেছে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, এমন অবস্থা বহাল থাকলে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান সমান থাকবে না। বাস্তবে তা হয়ও না। সব দেশে নামকরা কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার ভিত্তিতে সেখানে ভর্তি হয়। এমনটি আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বাছাই করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাছাই করা শিক্ষকদের নিয়োগ দিলে শিক্ষার মান বাড়বে বলে আশা করা যায়।

হয়নি। ফলে পুরনো সরকারি কলেজের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের সদ্য সরকারীকৃত কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলে তারা নানাভাবে হেনস্তা হয়েছেন। কেবল অধ্যক্ষ নয়, পদোন্নতির নামে পিএসসি কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষকদের সেখানে পদায়ন করা হলে তারাও স্বস্তিতে থাকতে পারেননি। নিয়মনীতি ভঙ্গ করে সরকারি শিক্ষকদের ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা দিয়ে পিএসসি মনোনীত শিক্ষকদের মাথার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। জুনিয়ররা সিনিয়র হয়ে গেলেন। এ অবস্থায় লেখাপড়া কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ জন্য এখন মেধাবীরা শিক্ষা কাডারে আসতে আগ্রহী হচ্ছেন না। বঙ্গবন্ধুর বৈশ্বিক পদক্ষেপের পর প্রাথমিক শিক্ষার সুফল লক্ষ্যীয় হয়ে উঠছে। অনেক উপজেলায় মাধ্যমিক স্কুল সরকারি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে বঙ্গপরিকর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশ র্ননির্ভরতার পথে। তিনি কয়েক শ বেসরকারি কলেজ সরকারের আওতায় আনলেন। এটা ভালো উদ্যোগ। সরকারীকৃত শিক্ষকরা আর্থিক সম্বল হবেন। আশার কথা, এঁদের পুরনো সরকারি কলেজে বদলির বিধান রাখা হয়নি। আবার একটু পেছনে ফিরে দেখি। দেশভাগের আগে পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি সরকারি কলেজ ছিল, তা-ই আছে। সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা সরকারিভাবে বেতনভাতা পান। তবে বিধিনিষেধ ছিল তারা আদি সরকারি কলেজে বদলি হতে পারবেন না। ফলে সেখানে শিক্ষার অর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। আমাদের শিক্ষাবান্ধব সরকার নতুন সরকারীকৃত কলেজ শিক্ষকদের পুরনো সরকারি কলেজে বদলির ব্যবস্থা রহিত করে শিক্ষার অপমৃত্যু রক্ষা করেছে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, এমন অবস্থা বহাল থাকলে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান সমান থাকবে না। বাস্তবে তা হয়ও না। সব দেশে নামকরা কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার ভিত্তিতে সেখানে ভর্তি হয়। এমনটি আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বাছাই করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাছাই করা শিক্ষকদের নিয়োগ দিলে শিক্ষার মান বাড়বে বলে আশা করা যায়। দৈনিক পত্রিকার সুবাদে জানা গেল, এবারের জাতীয়করণের আওতায় আসা কিছু কলেজের পাসের হার শূন্য। কারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভালো কোনো চাকরি না পেয়ে গ্রামগঞ্জের শিক্ষক হয়েছেন। তাঁদের সেখানে থাকাই শোভনীয়। পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার বড় কলেজগুলো সরকারের আওতায় এনেছিল এ দেশের সোচ্চার কণ্ঠকে বন্ধ করার জন্য। জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ কলেজ সরকারি করেছিলেন সমর্থন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে। এবারের সরকারীকরণ মনে হয় শিক্ষাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা। বিশ্বাস করা কঠিন নয়, এরপর শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত পথে চলবে এবং আগের তিক্ত অভিজ্ঞতার অবসান হবে।

লেখক : সাবেক শিক্ষক, রাজশাহী কলেজ